‘আমাদের জ্ঞানদন্ডে এক প্রান্ত শুদ্ধতম গণিত ... আর অন্য প্রান্ত ...কবিতা ’

আর্যনীল মুখোপাধ্যায়

বিনয় মজুমদারের কবিতা পাঠের অনেক প্রক্রিয়া, পদ্ধতি আছে। থাকা উচিত বলেই বিশ্বাস করি। আমি নিজেও নানা সময়ে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে পড়ার চেষ্টা করেছি ওঁর কবিতা। তবু আজকের লেখা শুরু করি অনুবাদক হিসেবে একটা পর্যবেক্ষণের কথা বলে। বিগত ১৫ বছর ধ’রে বাংলা ও আন্তর্জাতিক কবিতার শতাধিক দ্বিভাষিক অনুবাদ (বাংলা থেকে ইংরেজী ও উল্টোটা) করার সময়ে লক্ষ্য করেছি বাঙালী কবিদের মধ্যে পশ্চিমে সবচেয়ে সহজগ্রাহ্য বিনয়। ওঁর সামান্য কিছু কবিতার ইংরেজী অনুবাদ, যার কিছু জ্যোতি দত্তের, কিছু আমার, আন্তর্জালে ওঠামাত্রই আন্তর্জাতিক পাঠকতা ও হর্ষধ্বনি পেয়েছে। পরবর্তীতে, ইংরেজী ভাষায় বিশ্বকবিতার সর্বোচ্চ শ্রদ্ধেয় যে সংকলনটি, Poems for the Millennium – তার চতুর্থ ভল্যুমে স্থান পেয়েছেন বিনয়ের এই অনুবাদগুলি। এই সংকলনক্রমে তিনি হলেন বিশশতকের চার নম্বর ও আপাতত শেষ ভারতীয় কবি। বিনয়ের কবিতার অনুবাদকে ঘিরে পশ্চিমী পাঠকের এই বিস্ময় ও হর্ষকে যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি। কারো কারো সাথে সাক্ষাতে কথাও হয়েছে। প্রকৃতির কয়েকটি ভূমিদৃশ্য থেকে বিনয় যেটা পর্যবেক্ষণ করছেন, এবং সেটা যেভাবে কাব্যরসে চুবিয়ে, মেধামনন তন্দুরের যতোটা গভীরে তাকে নামিয়ে দিতে পারছেন, বিদেশী পাঠকের কাছে সেটা বিস্ময়বহন করে প্রায়ই। আমার বিবেচনায় এর মূল কারণ বিনয়ের দেখার চোখটা বিজ্ঞানীর, গণিতজ্ঞের, যার তুলনা পশ্চিমে, আধুনিককালে বিরল।

বিনয় মজুমদার লিখেছিলেন -

কাপড়ের অন্তরালে মানুষ বিলীন হয়ে যায় ;
মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়। তারপরে আবার গজায়
রোমশ মৃত্তিকা থেকে।
(কাপড়ের অন্তরালে)

গাছের মত, কাগজের মত, মানুষের মত কবিতারও পুনর্চক্র হয়। এক এক কবির মেজাজ, বাচন, বয়ান, ছন্দ, ভাষাব্যবহার পদ্ধতি অন্যজনে সংক্রামিত হয়। এই পুনর্চক্রের বৃত্ত থেকে এক একটা জিনিস কিন্তু চিরতরে হারিয়ে যায়। এক একটা অতিকায়, অসমান্তরাল, এক একটা চিরবিভ্রম। হারিয়ে যায় কারণ তারা ভয়াবহরকম ভিন্ন ছিল। জীবনচক্রে ঠিক খাপ খেল না, স্বাভাবিক নিয়মে অবনমিত হল। হয়ত বিনয় সেরকমই এক কবি। দেশ-বিদেশের অনেক কবিতা পড়তে পড়তে মনে হয়, তেমনভাবে খুঁজলে হয়তো অনেক কবির মধ্যেই অনেক কবিকে খুঁজে পাওয়া যায়। এই নিয়মাবলির বাইরে যে দু একজন থেকে যান তাঁদেরই একজন বিনয়। বিনয়ের মত একজন কবি পাশ্চাত্যে আজ কোথায় ? ইংরেজী ভাষায় ব্যতিক্রম বোধহয় কেবলমাত্র মার্কিন কবি মাইক ম্যাকক্লুয়র। বিনয়ের কবিতার শাঁসের খোঁজে, তাঁর কবি-মনস্তত্বের সন্ধানে আমাদের বারবারই যেতে হবে বিজ্ঞানে, জ্যামিতিতে, সংখ্যাতত্ত্ব, সাংখ্য ও অসংখ্যে। ভাষা, কবিতা ও তার সৌন্দর্যের পলান্নের ভেতরে বিনয়ের বিজ্ঞানবোধ যেন দারুচিনির সুঘ্রাণে জেগে থাকে। কবিতার সৌন্দর্য যেন গণিতের মত, ফুলের ফুল্লতায় কতটুকুই বা জ্যামিতি, তার চেয়ে ঢের বেশী জ্যামিতি জমিতে, কবিতার ছত্রে ছত্রে।

অনাদি সময় থেকে, গণিতরই মতো, বহু কবিতা রয়েছে
চুপচাপ পড়ে আছে কোনোদিন একে একে আবিষ্কৃত হয়
কোনো অঘ্রাণের রাতে বকুলবাগানে খুব মৃদু জোছনায়
(সকল বকুল ফুল)

ফুলের ভিতরে কোন জ্যামিতি বা জ্যামিতির ঈশারাও নেই
সব ফুল মিলে মিশে একাকার এলোমেলো হ’য়ে প’ড়ে আছে
জ্যামিতি জমিতে ছিল, পঙক্তিতে পঙক্তিতে শুধু জ্যামিতিই ছিল।
(‘অঘ্রাণের অনুভূতিমালা’ থেকে)

≈

২০:৫০ দশকের কবিদের ওপর জীবনানন্দের প্রভাব নিয়ে অনেক কিছু লেখা হয়েছে, তাই পুনরুক্তি বাঁচিয়ে বলি, আমার মনে হয়েছে জীবনানন্দের সবচেয়ে প্রত্যক্ষ প্রভাব বিনয়ের কবিতার ভাষায়, এবং তৎসঙ্গে এটাও ঠিক যে বিনয়ই জীবনানন্দকে পড়েছেন সবচেয়ে নতুন নিয়োজনে। সেই পাঠে যাবার আগে এটাও পাশাপাশি বলতে হয় যে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম কবিতার বই 'অনন্ত নক্ষত্রবীথি তুমি, অন্ধকারে'ও জীবনানন্দের গাঢ় রক্তে নিমজ্জিত, এমনকি বইটির শীর্ষকও জীবনানন্দের 'মাঘসংক্রান্তির রাতে' কবিতার প্রথম পংক্তি থেকে নেওয়া। এ প্রসঙ্গে টি এস ইলিয়টের একটা উক্তিকে সামান্য পাল্টে বলা যায় - আত্মসাৎ করলে সেটা ভালোভাবে করাই ভালো। ফলে মনে হয়, বিনয় যেন এইভাবে জীবনানন্দীয় চেতনার রক্তনালীগুলি তুলে নিয়ে তাঁর কবিতার বিজ্ঞানমনস্ক হৃদয় ও মস্তিষ্ককে পরিপুষ্ট করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, জীবনানন্দ লেখেন -

বিজ্ঞানের ক্লান্ত নক্ষত্রেরা
নিভে যায় ; - মানুষ অপরিজ্ঞাত সে আমায় ; তবুও তাদের একজন
গভীর মানুষী কেন নিজেকে চেনায় !

(সূর্য নক্ষত্র নারী/ বেলা অবেলা কালবেলা)

প্রজ্ঞার নাভিকেন্দ্র থেকে নক্ষত্রের অনুপাতে মানুষকে দেখা। তবু 'বিজ্ঞানের নক্ষত্রেরা' কি ঠিক বিজ্ঞানের নক্ষত্র ? ৭১ পংক্তির গোটা কবিতাটা পড়ার পর এই প্রশ্ন পাঠক করবেন। পাশাপাশি বিনয়কে লক্ষ্য করা যাক -

তাঁবুর ভেতরে শুয়ে অন্ধকার আকাশের বিস্তার দেখেছি,
জেনেছি নিকটবর্তী এবং উজ্জ্বলতম তারাদের প্রকৃত প্রস্তাবে
সব গ্রহ, তারা নয়, তাপহীন আলোহীন গ্রহ।

(শিশুকালে শুনেছি যে)

জাজ্বল্যমান যে সমস্ত তারাদের রাতের তাঁবু থেকে দেখা যায় তাদের অনেকেই যে মৃত গ্রহ, ঠান্ডা, আলোহীন, স্রেফ দূরত্বের কারণে ঐ আলো আজও আমাদের এই চোখে বাস্তব, বিনয়ের কবিতা সেই সত্যকেই প্রধানত উদঘাটন করে। তারারা যে 'তাপহীন, আলোহীন গ্রহ' এই জ্ঞানপুষ্ট বিনয়ের কবিতার পংক্তি; এবং এটা বিনয়ের কবিকৃতির মূল ভিত্তি বা কান্ড, যেটা অন্য কোনো বাঙালী কবির নয়, সে ২০:৫০য়ের দশকই হোক আর ২১:১০। আমার প্রায়শই মনে হয়েছে যে জীবনানন্দের প্রকৃতিবোধ এক ঐতিহাসিক চিত্রকলার গভীরে প্রথিত, আর বিনয়ের প্রকৃতি রিপোর্তাজ অনেকটা একটি scientific field journal রচনার মত। প্রকৃতির বিবিধে লুকিয়ে থাকা নানা ছোট-বড়-দৈনন্দিন সত্যকে আবিষ্কার করা হচ্ছে, তাকে তার পারিপারিপার্শ্বিকের আলোয় দেখা হচ্ছে এবং জার্নালে লিখে রাখা হচ্ছে উপাত্তের (data) মত।

অনেক পাঠকের কাছেই হয়তো কাব্যরসবর্জিত এক কেঠো ধারাবিবরণী, তবু বিনয়ের 'সূর্যগ্রহণের কালে' কবিতাটির কথা নিয়ে আসি আমি এই প্রসঙ্গে। কবিতা শুরু হয় এভাবে -

সূর্যগ্রহণের কালে কিছু লেখা ভালো - এই ভেবে
আজ লিখি। আজ হল তেসরা ফাল্গুন শনিবার
তেরোশো ছিয়াশী সাল। কিছুক্ষণ আগে দেখলাম
সূর্যের অর্ধেক ঢেকে ফেলেছে চাঁদের ছায়া। এই
লিখে ফের উঠলাম, গ্রহণ আবার দেখে আসি।
ঘড়িতে তিনটে বেজে উনত্রিশ মিনিট হয়েছে ;
গ্রহণ দেখতে গিয়ে দেখলাম মেঘের আড়ালে
সূর্য চলে গেছে, আমি দুইখানি আলোকচিত্রের
ফিল্ম একসঙ্গে নিয়ে তার মাঝ দিয়েই দেখেছি
সূর্যের গ্রহণ প্রায় দশবার, তবে বর্তমানে
সূর্যকে ঢেকেছে মেঘে।.....

(সূর্যগ্রহণের কালে)

কবিতাটির মূল চেহারা রিপোর্তাজের। যা ঘটছে আকাশের বিম্বে তাই শোনানো হচ্ছে সরল গদ্যে। অনেকেই প্রশ্ন করবেন - এখানে কবিতা কোথায়? বা এটা কি কবিতা? 'সূর্যগ্রহণের কালে' বিনয় মজুমদারের একটি অনুল্লেখযোগ্য কবিতা বললে একেবারেই ভুল হয় না। বা বিনয়ের কবিতার কঙ্কাল হয়তো। তবু এই কঙ্কালটিকে আগে চিনে নেওয়া দরকার। লিরিসিজম, বাকপ্রতিমা ও চেতনার রক্ত-মাংস-ছাল ছাড়িয়ে নিলে যে গাণিতিক যুক্তির কাঠামো বিনয় মজুমদারের কবিতাকে গড়ে, তার এক তুমুল নিদর্শন এই কবিতাটি।

তেসরা ফাল্গুন বিকেলের বিভিন্ন সময়ে এক একবার উঠে গিয়ে সূর্যগ্রহণের পরিস্থিতি দেখে এসে বিনয় তাঁর ভাষ্য লিখে যান। মানমন্দির থেকে সূর্যগ্রহণ দেখে একজন কবি একরকম ভাষ্য দেন, একজন বিজ্ঞানী দেন অন্য এক ভাষ্য; সাংবাদিক দেবেন অন্য দর্শন। বিনয়ের এই কবিতায় লক্ষ্য করি বৈজ্ঞানিক ধারাভাষ্যের সঙ্গে সাংবাদিক রিপোর্তাজের এক অনায়াস মিশ্রণ। কবি প্রায় অনুপস্থিত। সূর্যগ্রহণের মত একটি অপ্রতিনিয়ত জাগতিক ঘটনার বিবৃতি জুড়ে আছে তিনটি চরিত্র এবং তাঁদের পারস্পরিক অবস্থান - সূর্য, চাঁদ ও মেঘ। চতুর্থ চরিত্রটি লুকোনো - একটি ঘড়ি - সে সময়খন্ডে এই তিনজনকে আঁকে, তাদের পারস্পরিক অবস্থান। একটা চলমানতা শুরু হয়। ক্রমশ আস্তে আস্তে এই তিন চরিত্রের পারস্পরিক অবস্থান ছাপিয়ে ওঠে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক। এইভাবে চলতে চলতে দিনের বিভিন্ন সময়ে সূর্যগ্রহণের রিপোর্তাজের বদলে এক বৈজ্ঞানিক ধারাভাষ্য তৈরি হয়।

এই ধরণের একটি বিজ্ঞানমনস্কতা ও যুক্তিসন্ধানেই গড়ে ওঠে বিনয়ের কবিতার কাঠামো। কবিতা-আলোচকদের মধ্যে একটা ভুল ধারণা লক্ষ্য করি প্রায়ই - এই যে, বিজ্ঞানমনস্ক কবিতা বৈজ্ঞানিক তথ্যনির্ভর। বিনয় মজুমদার এই ধারণাকে সম্পূর্ণ হারিয়ে দেন। তাঁর কবিতার বৈজ্ঞানিকতা তাঁর পরিলক্ষণগুণে, যা এক প্রকৃত বিজ্ঞানীর দৃষ্টি। একটা দেখার চোখ যা বাংলা কবিতায় কখনোই ছিল না। পৃথিবীর খুব কম ভাষার কবিতায় আছে।

প্রকৃতিকে জীবনানন্দ অনুভব করেন। উপলব্ধি করেন। ক'রে তাঁর ইতিহাসচেতনা ও সমাজবোধের ভেতরে তার রসকে টানার চেষ্টা করেন। বিনয় প্রকৃতিকে পরিলক্ষণ করেন, এমনভাবে, যা পৃথিবীর আর কোন কবিতায় আমি কখনো পড়িনি। যেভাবে বিনয় লেখেন -

এসকল অনিশ্চিত অস্থিরতা, দ্বন্দ্ব ভেদ ক'রে
তবুও পাইনগাছ ঋজু হয়ে ক্রমে বেড়ে ওঠে,
প্রকৃত লিপ্সার মতো, আকাশের বিদ্যুতের দিকে।

(আমাদের অভিজ্ঞতা)

তার জুড়ি আমি অন্তত খুঁজে পাইনি। বিনয়ের কবিতাভাবনার কাঠামোয় বৈজ্ঞানিক যুক্তিসন্ধান, যুক্তিখন্ডন ও চলাচলবিদ্যার (logistics) যে মজবুত তক্তামারা সেটা চট ক'রে ধরা যায়। এবং সেই পুরটা চিনে ফেললে বোঝা যায়, তাঁর ভাষার এই জীবনানন্দীয় সমাচ্ছন্নতা আসলে বহিরাঙ্গের বিস্কুটগুঁড়ো মাত্র।

'প্রকৃত' শব্দটি বাংলা কবিতায় বিনয় মজুমদার যেভাবে ব্যবহার করেছেন আর কোনোদিন কাউকে সেভাবে ব্যবহার করতে দেখিনি। কেননা এই ব্যবহার এক প্রখর গাণিতিক গন্ডির বাসীন্দা না হলে বোঝা যায় না। 'প্রকৃত' শব্দটি বিনয় মজুমদারের কবিতায় একটি সমীকরণ চিহ্নের (=) মত। যখন জীবনানন্দ লিখলেন - ' কোথাও জলকে ঘিরে পৃথিবীর অফুরান জল র'য়ে গেছে', সেই তিনভাগ জলের গায়ে ঠিক সমীকরণ চিহ্ন বসেনা, জলকে তখনো কারো রূপক মনে হতে থাকে। কিন্তু বিনয় যখন লেখেন 'মানুষ নিকটে এলে প্রকৃত সারস উড়ে যায়', সেই সারসের মধ্যে 'প্রকৃত' শব্দটি নিয়ে আসে এক গাণিতিক অকাট্যতা (mathematical infallibility), যেরকমটা কোন ভাষার কোন কবিতাতেই আজ পর্যন্ত চোখে পড়লোনা। এই 'সারস'কে পোস্টমডার্ণ সারস ভেবে হাস্যাস্পদ হওয়া যায় না। ফলে ক্রমশ এটা হয়তো বোঝাতে পারছি যে বিনয় জীবনানন্দের অনেককিছু নিলেও ওঁর যুক্তিসন্ধানের বৈজ্ঞানিকতায় অসমান্তরাল রয়ে গেছেন।

বিনয় মজুমদারের কবিতায় আমি আরো কতগুলো বিজ্ঞানভাবনা লক্ষ্য করি। প্রথমত, 'অভিজ্ঞান' বা empericism। বিনয় যখন লেখেন - 'সকল ফুলের কাছে এত মোহময় মনে যাবার পরেও/ মানুষেরা কিন্তু মাংস রন্ধনকালীন ঘ্রাণ সবচেয়ে বেশী ভালোবাসে।', তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে উঠে আসে এই সত্য; অবরোহী (deduction) পদ্ধতিতে। আরো মনে হয়,

বিনয় তাঁর কবিতার ভাষা ও যুক্তির মধ্যে খুব গভীরভাবে বপন করেন প্রক্ষেপণ পদ্ধতি (interpolation technique), দুভাবে -

১। অনুক্ষেপণ (intrapolation)

২। উৎক্ষেপণ (extrapolation)

একটি দুটি প্রাকৃতিক দ্বন্দ্ব-সত্যকে আবিস্কার ক'রে, তার সমতুল্য অন্য একটি প্রাকৃতিক দ্বন্দ্ব-সত্যে পৌঁছে যাবার একটা প্রবণতা (অনুক্ষেপণ) লক্ষ্য করি বিনয়ের কবিতায়। যেমন -

এখন আহত মাছ কোথায় যে চলে গেছ দূরে,
তুমিও হতাশ হয়ে রয়েছো পিছন ফিরে, পাখি ।
এখনো রয়েছে ঐ বর্ণময়, সুস্থ পুষ্পোদ্যান ;
তবুও বিশিষ্ট শোকে পার্শ্ববর্তী উদাত্ত সেগুন
নিহত, অপসারিত, আর নেই শ্যামল নিস্বন।

(স্রোতপৃষ্ঠে চূর্ণ চূর্ণ)

দূরে থাকা আহত, অভিমানী মাছ থেকে, পিছনে ফিরে থাকা পাখি থেকে অনুক্ষেপণে বিনয় পৌঁছে গেলেন বিশিষ্ট শোকে থাকা উদাত্ত সেগুনে। বাগান কিন্তু বর্ণময় ছিল, সুস্থ ছিল। তবুও সেগুন শোকে বিশিষ্ট। মাছ আর পাখির মুড থেকে এই তার প্রক্ষিপ্ত অবস্থান। ঠিক এইভাবে মিলের বদলে দ্বন্দ্ব প্রকাশে পায় -

এই যে অমেয় জল - মেঘে মেঘে তনুভূত জল -
এর কতটুকু আর ফসলের দেহে আসে বলো ?
ফসলের ঋতুতেও অধিকাংশ শুষে নেয় মাটি।
তবু কি আশ্চর্য, দ্যাখো, উপবিষ্ট মশা উড়ে গেলে
তার এই উড়ে যাওয়া ঈষৎ সঙ্গীতময় হয়।

(কাগজকলম নিয়ে)

এক গভীর বৈজ্ঞানিক আচ্ছন্নতা ওপরের প্রত্যেকটা পংক্তির প্রকোষ্ঠে। ঐ ভেসে যাওয়া মেঘ, যাকে অধিকাংশ কবিই নির্ভার ভাবেন, পেঁজা তুলো ভাবেন, যাকে দেখে সেই কালীদাস থেকে শুরু করে আমাদের মনে আজ পর্যন্ত কেবল ভাবের উদয় হয়, সেই মেঘ আসলে জলের আধার। জমা জলীয় বাষ্পের কুন্ডলী - a body of water। 'তনুভূত জল' - এভাবে বাংলা কবিতা কেবলমাত্র বিনয় মজুমদার লিখতে পারেন। সেই তনুভূত জলের কতটুকু ফসলের দেহে আসে ? সবটাই তো মাটি টেনে নেয়। গ্রাউন্ড-ওয়াটার। এখানে লক্ষ্য করি, প্রকৃতির জলচক্র বা water cycle সম্বন্ধে একটা প্রচ্ছন্ন জ্ঞান ও সচেতনতা রাখা। এই সমস্ত তথ্যের কেন্দ্রীভূত একটা হতাশার ভাব থেকে বিনয় কিন্তু আচমকা পৌঁছে গেলেন 'সঙ্গীতময়' মশায়। অনুক্ষেপন পদ্ধতিতে (interpolate ক'রে)।

ঠিক একইভাবে উৎক্ষেপণ পদ্ধতি লক্ষ্য করা যায় ওঁর কবিতায়। উৎক্ষেপন পদ্ধতিতে (extrapolate ক'রে) বিনয় একটি নিবিষ্ট প্রাকৃতিক সত্যান্বেষণ থেকে অনেকসময়েই পৌঁছে যান মানুষের জীবনে, স্বভাবে । যেমন -

দেবদারু, আমি স্পষ্ট পেচকের মতো গহ্বরের
স্বস্তি অভিলাষী, তবু ফিরে আসি পূর্ববর্তী ফুলে
ক্বচিৎ কখনো, কোনো ফোঁড়া হলে নিষিদ্ধ হলেও
যে কারণে তার কাছে অগোচরে হাত চ'লে যায়।

(শূন্যকে লেহন করো)

না চাইতেও দেবদারুতে ফুলের ফিরে আসাকে উৎক্ষেপণ ক'রে বিনয় মানুষের বিস্মরণপ্রিয় স্বভাবের প্রসঙ্গে চলে যান। তুলনা দেন অসাবধানে নিজেদের ফোঁড়ায় হাত দেবার সাথে।

≈

জীবনানন্দের কবিতা সম্বন্ধে বিনয় মজুমদারের কিছু মজার পর্যবেক্ষণ আছে, যা পরিসংখ্যাকিয় প্রমাণিত নয়, হয়তো যথেষ্ট অর্থ বা গবেষণা সম্পদ পেলে বিনয় সেটা প্রমাণও করতে পারতেন। যেমন বিনয় মনে করেন, জীবনানন্দের কবিতায় অন্যতম বহুব্যবহৃত শব্দ তাঁর নিজের নামেরই গোড়াটুকু - 'জীবন'। এই শব্দের কতগুলো ব্যবহার জীবনানন্দে রয়েছে তার একটা লম্বা ফিরিস্তি বিনয় দেন 'ধূসর জীবনানন্দ' (কবিতীর্থ) বইতে। সেখানে দেখা যাচ্ছে জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা (ভারবি, দ্বিতীয় সংস্করণ, সপ্তম মুদ্রণ, ১৯৮৮) কাব্যগ্রন্থের ১১ থেকে ১১১ নম্বর পাতা পর্যন্ত যত কবিতা আছে, সেখানে 'জীবন' শব্দের সুপ্রচুর ব্যবহার। তার একটা পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরি করেছিলেন বিনয়। এই 'জীবন' শব্দটাকে সহজাত পদ্ধতিতে দ্ব্যর্থবোধে ব্যবহার করা হয়েছে। নিজের নামের দ্ব্যর্থবোধক ব্যবহার রবীন্দ্রনাথ ও মধুসূদনেও পাওয়া যায়, কিন্তু বিনয়ের মতে 'জীবন' শব্দটাই এমন ব্যপ্ত একটা শব্দ, জীবনানন্দকে এ নিয়ে বিশেষ কসরত করতে হয়নি। এ প্রসঙ্গে বিনয় লেখেন -

'এবং কবি জীবনানন্দ দেখলেন, দ্ব্যর্থবোধক কবিতা ও বাক্য লেখার জন্য কবিকে বিশেষ কসরত করতে হয়না - দ্ব্যর্থবোধক বাক্য লিখবো না ভাবলেও বাক্য দ্ব্যর্থবোধকই রয়ে যায় - 'জীবন' শব্দটি এমনই শব্দ। 'জীবন' শব্দটি এমনই এক শব্দ যাকে দ্ব্যর্থবোধক না করাই এক সমস্যা। খুব ক্বচিৎ কদাচিৎ একার্থবোধক বাক্য হয়, 'জীবন' শব্দটি থাকা সত্ত্বেও। যেমন 'মোদের জীবনে যবে জাগে পাতাঝরা হেমন্তের বিদায় কুহেলি-'। এই বাক্যে 'জীবনে'র দুই মানে করা যায় না। উপরলিখিত চিন্তাগুলি কবি জীবনানন্দ নিশ্চয় করেছিলেন। .... নিজের নাম দিয়ে জীবন (জীবনানন্দ) কাজটি সহজে হাসিল করেছেন। তাঁর নাম জীবনানন্দ না বলে জীবনবাবুও বলা যায়'।

জীবনানন্দের কবিতায় যেমন স্বনামের দ্ব্যর্থ, তেমনি বিনয় মজুমদারের কবিতার যে কাব্যতত্ত্ব বা কবিতাকারিতা (poetics) তার অনেকটাই আমার মনে হয় বিনয়ের কবিতার মধ্যেই পাওয়া যায়। নিজের লেখার প্রকোষ্ঠে নিজের কবিতাভাবনাকে ধরে রাখা প্রচেষ্টা, যা ১৯৫০ পরবর্তী সময়ে, পশ্চিমে, প্রকৃত পোস্টমডার্ণ বা উত্তরাধুনিক এক প্রবণতা বলে চিহ্নিত হয়েছে, সেটা বিনয়ের লেখার দ্বিতীয়ার্ধে ভীষণভাবেই স্বচ্ছ। আমার মতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ, অসমান্তরাল এবং সবচেয়ে উপেক্ষিত বাংলা কবিতা বিনয় মজুমদারের 'কেমন মোহানা'। পনের পাতার গদ্যরূপী কাব্যলিপিতে ঠাসা এই দীর্ঘ কবিতায় বিনয়ের কবিতাভাবনা কবিতার রূপে, প্রকাশে বার বার ধরা পড়ে। এর কিছু উদাহরণ এই প্রবন্ধের একাধিক স্থানে পরে ব্যবহৃত হয়েছে। এক জায়গায় নদীর মোহানা সম্বন্ধে বিনয় লেখেন - 'মনে হয় মোহানাই, মোহানার বর্ণনাই আসলে সে গণিত কবিতা - / গণিতের কবিতার হুবহু বর্ণনামাত্র'। আরেকটা কবিতা 'সরস্বতী পূজা দ্বিতীয়া', যাকে সাধারণ্যে এড়িয়ে যাওয়া হয়, সেখানেও রয়েছে কবির কাব্যভাবনার ভরাপাত্র। সেখানে এক জায়গায় বিনয় লিখছেন -

হলুদ খোসার নীচে আসল কলার রঙ সাদা ব'লে মনে হল, কিন্তু সাদা কেন?
আমি মনে মনে বেশ বিচলিত হয়ে পড়ি, আসল কলার রঙ ঈষৎ গোলাপী
হবার কথা না - এই প্রশ্নটি আমার মনে আন্দোলিত হতে থাকে কলাটিকে দেখে।
ইন্টারপোলেশন - অন্তর্দভীকরণের দ্বারা এই সমস্যার সমাধান হয়
.....
... দেখা যায় চতুর্মাত্রা সমন্বিত বাস্তব রয়েছে
অনেক - গণনাতীত সংখ্যায় রয়েছে, বস্তু চলমান হলেই তা চতুর্মাত্রাময়।
আমরা ভূপৃষ্ঠে যারা বাস করি তারা সব সর্বদাই চলমান, বিছানায় শুয়ে
থাকলেও চলমান, ওই দূর শতভিষা রেবতী কৃত্তিকা মঘা ইত্যাদির চোখে।
অর্থাৎ আমরা সব চতুর্মাত্রা সমন্বিত, আজ এই সরস্বতী পূজার সময়ে
এই কথা মনে পড়ে, অভিভূত হয়ে পড়ি, প্রতিমাকে নমস্কার ক'রে ফেলি আমি।

এ কবিতা কোনো বাঙালী কবি লেখেননি, লেখা সম্ভবও না। এক প্রত্যন্ত, সহজাত, সদাকৌতূহলী বিজ্ঞানী মন না থাকলে এভাবে কবিতাকে ভাবাই যায় না। লেখবস্তু গড়ে তোলা যায় না। বিনয় মজুমদার গণিত নিয়ে স্নাতকোত্তর চর্চা করেননি, খুব উচ্চগণিতের ক্ষেত্রে যাবার সুযোগ পাননি। পেলে, হয়তো এমন আরো কবিতা আমরা বাংলা ভাষায় পেতাম যা বিশ্বকাব্যেও অননুকরণীয়। কাজেই বিনয় যে বিজ্ঞান বা গণিতবোধে কবিতা লিখেছেন তা আজকের বহু তরুণতর কবিদের

কাছে সহজ, সর্বজনিন বিজ্ঞান। ওপরাংশের কবিতাতেও সেটা রয়েছে। সাধারণত মনে করা হয়, পরিচিন্তন কবিতার 'কবিত্ব'কে নষ্ট করে। কবিতা পঙক্তি যেন খানিকটা দৈবের মননবৃষ্টির ফলাফল। আচমকা, অপ্রত্যাশিত, অনির্ধারিত তাকে সর্বদাই উত্তোলিত করে চলেছে। বিনয়ের কবিতার অনেক অংশে কিন্তু পরিচিন্তনের প্রাধান্য। গাণিতিক বা বৈজ্ঞানিক মন পরিচিন্তনের মাধ্যমেই কাজ করে। বিনয় যেভাবে তাকে সেই প্রকাশকে কাব্যগুনান্বিত করে তুলেছেন, আসল উৎকর্ষের জায়গা সেটা।

হলুদ খোসার নিচে কেন বিনয় গোলাপী কদলীগাত্র আশা করেছিলেন? খুব সহজ। VIBGYOR অনুযায়ী হাল্কা কমলা বা 'গোলাপী' আসার কথা। উৎক্ষেপণ করে বিনয়ের মতোই বলতে পারি, তাঁরই কাব্যযুক্তি অনুসরণ করে, "কমলালেবুর খোসার নীচে আসল লেবুর রঙ কমলাই ব'লে মনে হল, কিন্তু কমলা কেন?/ আমি মনে মনে বেশ বিচলিত হয়ে পড়ি, আসল লেবুর রঙ ঈষৎ রক্তিম/ হবার কথা না – এই প্রশ্নটি আমার মনে আন্দোলিত হতে থাকে কমলালেবুটিকে দেখে।"

কলার আসল রঙ কেন সাদা? - এই প্রশ্ন থেকে বিনয় চলে গেছেন চতুর্মাত্রিক বিশ্বে। ত্রিমাত্রিক এই বিশ্ব (যদিও এ সময়ের পদার্থবিদদের মতে স্পেস আরো বহুমাত্রিক, একুশ বা তার বেশি), আর সময় হলো তার চার নম্বর অক্ষ। এই ধারণার প্রত্যয়ে কবির ভাবনা শুরু হয়। আর আকাশের তারা সারারাত জুড়ে যেমন জায়গা বদলায়, অ্যাবসোলিউট কো-অর্ডিনেটে কোনো নড়নচড়ন ছাড়াই, আমাদের আপেক্ষিক চোখে, তেমনই তাদের চোখেও আমরা বিছানায় শুয়েও ক্রমাগত জায়গা পাল্টে যাই।

একজন কারিগরি গণিতবিদ হিসেবে শুধু একটাই কথা আমার মনে হয়েছে এখানে। কলার আসল রঙের থেকে জগতের চতুর্মাত্রায় পৌঁছে যাবার প্রক্রিয়াকে গাণিতিক বুদ্ধিতে আমার 'অন্তর্দন্ডীকরণ' (আমি interpolation এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে 'অনুক্ষেপণ' শব্দটা ব্যবহার করলাম) মনে হয়নি, বরং উৎক্ষেপণ (extrapolation) পদ্ধতি মনে হয়েছে। আবার এমনও হতে পারে বিনয় ভেবেছেন একটি বাহ্যবস্তুর (কলা) ভাবনা থেকে নিজের দিকে চ'লে আসা অনুক্ষেপণই।

নিজের কবিতায় কবির নিজস্ব কাব্যতত্ত্বকে ধরে রাখার প্রবণতা প্রসঙ্গে আবার ফিরে আসি 'কেমন মোহানা' কবিতায়। উত্তরাধুনিকতার আলোয় বিনয়কে বাঙালী বা প্রতীচ্যের তাত্ত্বিক কীভাবে দেখবেন জানি না, কিন্তু এই কবিতার একাধিক জায়গায় আমার সেইসব ভাবনা ও মনোভাবের সাথে বারবার দেখা হয়ে যায় যা উত্তরাধুনিকের মূলমন্ত্র। কবিতা শুরু হয় এই পঙক্তি দিয়ে –

'কেমন মোহানা, চুপে মোহানারই মতো হয়ে চারিপাশে এলিয়ে রয়েছে।'

ক্রমে ক্রমে আরো কিছু পংক্তি আসে, যেমন –

'এভাবে মোহানাকে বিছানাই বলা যায়, বিছানায় বিছানাই মেশে।'

'যে কোন প্রাণির মতো জলের নিজের জাতি আছে।/ পৃথিবীতে জলদের নিজেদের জলবংশ চিরকাল আছে এইভাবে।'

'এত পাখি বলে তাই পাখি নয়, তার চেয়ে পাখিত্ব রয়েছে বলা ভালো-
প্রচুর পাখিত্ব আছে এইখানে মোহানাতে, মোহানাকে ভালোবাসে ব'লে,
যেমন আমিই বাসি, সকল পাখিত্ব তাকে ঘিরে ঘিরে উড়ে ফেরে
উপরে সাঁতার কাটে;'

'পাখিরা যদি না পারে তবু এ পাখিত্ব নিচে তলদেশে ঘষাঘষি করে।'

'হয়তো বা মোহানার কথা ভাবে, মোহানায় ডুবে শুধু তাই ভাবা যায়।'

'মনে হয় মোহানাই, মোহানার বর্ণনাই আসলে সে গণিত কবিতা-'

ওপরে উদ্ধৃত সমস্ত পংক্তির মধ্যেই, গণিতে যাকে বলে *প্রতিফলক ধর্ম* বা reflexive property (a=a; or a=b; thus, b=a), তার নিদর্শন। উত্তরাধুনিক কবিতাভাবনার অনেক পন্ডিতই এমনটা মনে করেছেন সে কবিতার এক উল্লেখযোগ্য

প্রবণতা উপমা বা রূপকের রূপকতাকে হ্রাস করা, তাকে নিজের দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে। টেবিলে রাখা ফলের রেকাবী কোনো রূপক নয়, ফলের রেকাবীমাত্র, বা ফলের রেকাবীর রূপক ফলের রেকাবী। এই প্রবণতায় আচ্ছন্ন বিনয়ের 'কেমন মোহানা' কবিতা। ১৫ পাতার ঠাসা কবিতায় ১৪০ বার ব্যবহৃত হয়েছে 'মোহানা' শব্দটা। মোহানাকে ঘিরে যা কিছু সমস্তই সেই মোহানারই ধর্ম হয়ে উঠতে চায়। আর কবি সেই মোহানার ভেতরে নারী শরীরে প্রবেশ করার মতো মানসিক অস্থিরতা ও কামনায় আনচান করেন।

উত্তরাধুনিক প্রবণতার আর একটা দিক কবিতায় শব্দের, ভাবনার অর্থবৈচিত্র্য। একটা কাব্যভাবনাকে ঘিরে একাধিক অর্থ, বিশ্লেষণ ও তাৎপর্য তৈরি করতে পারা, যাতে এক একজন পাঠক এক এক ভাবে নিতে পারেন কবিতাকে। একার্থে সমাসক্ত হয়ে কবিতার বিচিত্রবৈভব যাতে নষ্ট না হয়ে যায়। এই উত্তরাধুনিক তত্ত্বভাবনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ও উদাসীন হয়েও, একক ও সঠিক যুক্তির খোঁজে নেমেও কিন্তু বিনয় লিখছেন –

কোনো এক বিষয়ের বিশ্লেষণ ক'রে তাতে ভুল আছে কিনা জেনে নিতে,
এক ফোঁটা ভুলভ্রান্তি আছে কিনা এ খবর ঠিকমতো জেনে নিতে হলে
বহু বিষয়ক মিশ্র বিশ্লেষণ করা ভালো, করা বড়ো দরকারি যাতে
এক বিশ্লেষণ দিয়ে যে কোনো বিষয় বেশ পরিষ্কার বোঝা যেতে পারে।
তাহলে কোথাও কোনো ভুলভ্রান্তি আছে কিনা সহজেই ধ'রা পড়ে যায়,
সকল বিষয় এসে নিজেরাই এ সকল যেচে বলে দিয়ে যায়,
দেখিয়ে দেয় কোথায় পাহাড়, নদী, প্রান্তর মোহানা এইসব;

≈

'ফিরে এসে চাকা' পর্যায়ের কবিতাকে অনেকে প্রেমের কবিতা ব'লে থাকেন। প্রেমের কবিতার একটা বড় গুণ, বিপদ ও সীমাবদ্ধতা এই যে কবিতার বিষয় অতিরিক্ত নির্দিষ্ট। কবিতা যেন সেই মাছের চোখের একক - একটি পুরুষ বা নারী বা প্রকৃতিকে কেন্দ্র ক'রে আবর্তিত। তার দিকেই নিয়ত ধাবমান। তাকে উদ্দেশ্য ক'রেই কবিতার ভাবনা-তীর। বিনয়ের প্রেমের কবিতা ঠিক সেরকম নয়। সেখানে নারী ও প্রকৃতি সমান, সমবর্ধমান। রয়েছে নিজস্ব যুক্তিসন্ধান, লিরিসিজম, বিজ্ঞানমনস্কতা ও ধারাভাষ্য। প্রেম, একটি বিশেষ নারী, বা শুধুমাত্র নারীকে অবলম্বন করে নেই। পাবলো নেরুদার বা পল এল্যুয়ারের প্রেমের কবিতা পড়তে ব'সে আজকাল ক্লান্ত, বিরক্ত বোধ করি। কবিতাকে একচক্ষু দানব মনে হয়। বিনয় মজুমদারের প্রেমের কবিতা ঠিক তার বিপরীত মেরুতে ব'সে পুরনো পাঠেও নতুন ক'রে মুগ্ধ করে। বিনয় লেখেন -

অভিজ্ঞতা থেকে ক্রমে আকাশের বর্ণহীনতার
সংবাদের মতো আমি জেনেছি তোমাকে, বাতাসের
নীলাভতাহেতু দিনে আকাশকে নীল মনে হয়।

(অভিজ্ঞতা থেকে ক্রমে)

আকাশ কেন নীল ? এই প্রশ্ন এতকাল বিজ্ঞানীর ছিল। আজ হল কবির। এবং সেই প্রশ্নের অনুসন্ধানে নিয়োজিত সেই কবি যখন সত্য-উদ্‌ঘাটন করেন, টের পান আকাশ প্রকৃত বর্ণহীন, তখন তার প্রেমিকাকে মনে হয় - 'আকাশের বর্ণহীনতার সংবাদের মতো'। পৃথিবীর কোনো দেশ থেকে প্রকাশিত কোনো কবিতা বই আমাকে এমন অপূর্ব কবিতা শোনায়নি কোনোদিন।

≈

১৯৮০র দশক ও তার পরবর্তী সময়ে বিনয়ের কবিতার মধ্যে একটা যৌনতার প্রাবল্য আসে। এটা সাধারণ মত, যদিও আমার চোখে যৌনসচেতনতা ওঁর কবিতাজীবনের প্রায় প্রথম পরিচ্ছেদ থেকেই। ওঁর প্রেমের কবিতায় যৌনতার জায়গা অত্যন্ত বৈধ। ফলে স্বাভাবিকভাবেই যৌনতার রেখাপাত 'ফিরে এসো চাকা' পর্যায়ের কবিতাতেও ছিল। অনেকেই বিনয়ের এই রসসিক্ত অবস্থার কবিতাকে এড়িয়ে যেতে চান। 'আদিরসাত্মক' বা 'যৌনপাগলামি' বলে সরিয়ে রাখেন। আবার অন্য অনেকে যেমন আপত্তি করেননি, তেমনই অনাগ্রহের পর্দা ফেলে রেখেছেন তার ওপর। অথচ এই পর্যায়ের কবিতায়, যাকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো অনেকেই 'আদিরসাত্মক' বলে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন, অন্তত তিনটে উৎকর্ষ আছে

যা বাংলা কাব্যের ইতিহাসের সাথে যেমন সংযোগ রাখে (এবং যে খাতে তাকে আদি ঐতিহ্যানুসারীও বলা যায়) তেমনি চূড়ান্তরূপে অতুলনীয়।

প্রথমত আদিরস, যা নির্লজ্জতায় প্রায় বৈষ্ণবসাহিত্যের একাংশের সমতুল্য। কেউ একে 'বিকৃত' বা 'বিপথগামী' বা 'perverse'ও বলতে পারেন হয়তো, যদিও সে যুক্তিতে গোটা বৈষ্ণব সাহিত্য ও শাক্ত সাহিত্যের কিয়দাংশ ঘোর অশ্লীল বিবেচিত হবে। খুব সূক্ষ্মভাবে নারী-পুরুষের যৌনমিলনের অংশ হিসেবে মুখমেহনের (fellatio) উল্লেখ করেছেন একাধিকবার, এনেছেন নারী পুরুষ উভয়েরই রাগরস স্খলনের কথা, নানা যৌনভঙ্গির উল্লেখ ইত্যাদি। অথচ চুম্বন? তার দেখা মেলেনা প্রায়। বিনয়ের কবিতায় যৌনরসের দ্বিতীয় বিশেষত্ব রূপকতা। কখনো যৌনক্রীড়া, কখনো যৌনাঙ্গ, কখনো পূর্বরাগকে বৈশ্বিক রূপকের মত ব্যবহার ক'রেছেন বিনয়। নানাপ্রসঙ্গে। যেমন -

তারপর ভাবলাম ভুট্টাতে গুহার রস লেগে থাকা ভালো।
তাতে বেশি সুখ পাবো, রস শুঁকে আনন্দও পাবো

(আমার ভুট্টায় তেল)

এসে তেল মাখা হাতে আমার ভুট্টাটি চেপে ধরে।
যখন ধরল তার আগেই ভুট্টাটি খাড়া হয়ে গিয়েছিল।
চাঁদ আমি দুজনেই মেঝেতে দাঁড়ানো মুখোমুখি
এক হাতে ঘসে ঘসে ভুট্টার উপরে চাঁদ তেল মেখে দিল।

(চাঁদের গুহার দিকে)

চাঁদ, ভুট্টা, গুহা, তেল ইত্যাদি উপাদানের সাহায্যে একটা প্রাকৃতিক পরিবেশ গড়ে তোলার বদলে গড়েছেন সঙ্গমদৃশ্য। প্রকৃতির গভীরে রচিত এক সঙ্গম যেখানে প্রকৃতির মৌলগুলোই মিশে আছে এক অতি ফ্রয়েডীয় ইঙ্গিতময়তায়। আবার তেল মাখিয়ে , পুড়িয়ে, তার ওপর লেবুর রস মাখিয়ে ভুট্টা খাবার পদ্ধতিকেও যৌনরূপকের মতো ব্যবহার করেছেন। আহার ও যৌনতা, দেহরস ও স্বাদ মিলে মিশে এক হয়ে গেছে। আবার লক্ষ্য করি -

বিশেষ্য যখন ক্রিয়াপদ করে আমার সহিত
মাঝে মাঝে দুই পায়ে সর্বনাম কোমর জড়িয়ে
ধরে সে। এবং আমি ক্রিয়াপদ করি নানা পদ্ধতিতে যথা
সম্পূর্ণ উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ি বিশেষ্যের উপরে এবং
সর্বনাম দুই হাতে বিশেষ্যের দুই কাঁধ ধরে ক্রিয়াপদ করি।

(বিশেষ্য যখন)

আপাতভাবে মনে হবে কামসূত্র বা কোন আধুনিক যৌনক্রিয়ার ইন্সট্রাকশন ম্যানুয়াল থেকে তুলে নেওয়া এই কবিতা। কিন্তু বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম ও ক্রিয়াপদেরা নিজেদের কাজে নেমে এই যৌন নির্দেশাবলীকে কবিতা করে তোলে। ভাষার যে খেলা দিয়ে গড়ে ওঠে কবিতা, এই সঙ্গম যেন তারই রূপক হয়ে উঠছে বলে আমার মনে হয়েছে।

তৃতীয় বিশেষত্বটা আমার কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় কেননা এমন উদাহরণ বিশ্বকবিতার চাতালেও বিরল। এখানে বিনয় তাঁর স্বভাবজ প্রযুক্তি, বিজ্ঞান ও গণিতের নজর দিয়ে যৌনক্রিয়াকে দেখেন এবং দুটি মানুষের যৌথ শরীরক্রিয়ার মধ্যে এমন কিছু পর্যবেক্ষণ করেন, ক্রিয়া ও নিষ্ক্রিয়া, যা অন্য কারো পক্ষে করা সম্ভব নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ -

পৃথিবীতে বহু গান গাওয়া শেষ হল, সুর শুনে, ব্যাথা পেয়ে আজ
রন্ধনকালীন শব্দ ভালোবেসে, কানে কানে মৃদু
অর্ধস্ফুট কথা চেয়ে, এসেছি তোমার দ্বারে চাকা।
মুগ্ধ মিলনের কালে সজোরে আঘাতে সম্ভাবিত
ব্যাথা থেকে মাংসরাশি, নিতম্বই রক্ষা করে থাকে।

(২৯ শে জুন, ১৯৬২)

লক্ষ্যণীয়, এখানেও অনুভূতির তীব্রতার চেয়েও যৌনসঙ্গমের প্রযুক্তির ওপর বিনয় গুরুত্ব আরোপ করেন। সঙ্গমকালীন শারীরবিজ্ঞানের ওপরেই তাঁর বেশি জোর। পদার্থবিদ্যায়, যন্ত্র-প্রকৌশলবিদ্যা বা মেকানিকাল ইঞ্জিনীয়রিঙে spring-mass-damper নামে একপ্রকার যন্ত্রমৌলের কথা পড়ানো হয়। কারিগরি শিল্পের সর্বত্র এই যন্ত্রমৌল ব্যবহৃত হয়, যেমন গাড়ির সীট, ঘরের স্বয়ংক্রিয় দরজা, অসংখ্য চিকিৎসাযন্ত্র ইত্যাদি। একটা স্প্রিঙের ওপর বল কাজ করে যখন, স্প্রিংটা সংকুচিত হয়, বা দীর্ঘায়িত হয় (বলের দিশার ওপর নির্ভর ক'রে)। এটা ঘটে এক ঝটকায়, যেমন গাড়ি রাস্তার বাম্পের ওপর দিয়ে যাবার সময় গাড়ির পেছনের সিট ঝাঁকায় এবং তার নিচের স্প্রিং এক ঝটকায় বেঁটে হয়, এতে সোয়ারিদের ঝটকা আঘাত লাগে। সেই ঝটকাকে কমিয়ে এনে মসৃণ করতে স্প্রিঙের সাথে লাগানো হয় ড্যাম্পার। ড্যাম্পার সেই শক্‌টার অনেকটা শুষে নেয়, স্প্রিং সংকোচনের বেঘ বহুগুণ কমিয়ে আনে। মুগ্ধমিলনের কালে স্ত্রীলিঙ্গে পুংলিঙ্গের দ্রুত সঞ্চালন যে আঘাত হানে, তাকেও নারী দেহের কোমর, মাংশরাশি, নিতম্বের মেদময়তা বা অ্যাডিপোস্‌ ড্যাম্পার একইভাবে রক্ষা করে। সঙ্গমকালীন মানবদেহের মেকানিক্সের ভাবনাকে নিপুণ কাব্যসম্ভারে সাজিয়ে তাকে কবিতার দেশে অভিবাসিত করতে পারা চাট্টিখানি কথা নয়। এই প্রয়াস আমার অন্তত বাংলা কবিতার কোনো গলিঘুঁজিতেও চোখে পড়েনি কোনোদিন। বিশ্বসাহিত্যেও কদাচিত।

মা ও স্ত্রী বা প্রেমিকা যেমন পুরুষের জীবনের দুই পর্বের মাধ্যাকর্ষণ, বিনয়ের কবিতার সেই দুইজন কবিতা ও গণিত। কবিতা ও গণিতকে নারী ও পুরুষের মতো দেখেছেন বিনয় এবং তাদের তীব্র আকর্ষণ ও উতুঙ্গ রতিক্রিয়া ও রসস্খলনের মাধ্যমে গড়ে তুলেছেন নিজের কবিকৃতি। নিজের কবিতার কবিতাতত্ত্ব বা poetics নিজের কবিতার অভ্যন্তরে সাজিয়ে নেবার যে প্রবণতার কথা একটু আগে বলছিলাম, এক্ষেত্রে, এই উদাহরণেও তার আস্তিক্য -

আমাদের জ্ঞানদন্ডে এক প্রান্ত শুদ্ধতম গণিত নামক শাস্ত্র আর
অন্য প্রান্ত আমাদের সকলের পরিচিত কবিতা ও কাব্য - কাব্যগুলি।
এ এক নিয়মমাত্র, গণিত যে ধারে থাকে আসলে বিশ্বের সব রস -
বিশ্বের সকল রস জড়ো হ'য়ে এসে জমা হ'য়ে থাকে রসের আকারে।
অন্য ধার যেই ধারে কবিতা রয়েছে তার মুখ দিয়ে এই রস পড়ে,
বার হয়ে এসে পড়ে বাহিরের জগতে ও জগতের মোহানাগুলিতে।

(কেমন মোহানা)

≈

বিনয়ের শেষ বই আকাদেমি পুরস্কার পাওয়া 'হাসপাতালে লেখা কবিতাগুচ্ছ' (কবিতীর্থ)। আমার মতো যাদের নেশা কবিতা ও পেশা গণিত, বিনয় মজুমদারের প্রতি তাদের অনেকেরই একটা বিশেষ আনুগত্য। সেটা প্রায় অবশ্যম্ভাবী। গণিত ও জ্যামিতিকে প্রকৃতির সব রন্ধ্রে বিনয়ের মতো আর কেই বা লক্ষ্য করেছেন। মানসিক হাসপাতালে সামান্য সেরে ওঠা অতিকৃশ কবিকায়া নিয়েও বিনয় লেখেন -

অথচ মাটিতে যারা হাঁটি, চলি কথা বলি
অবস্থা আমারি
মতন, সহজে বোঝা যায়, মনে হয় সব জ্যামিতিই ঘোরে
নাচে কথা বলে কিন্তু রোমাঞ্চ উল্লাস প্রেম এসব কি
জ্যামিতিতে থাকে ?

তবু বলবো, হতাশার জন্মরহস্যও এখানে, এই বইটায় আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা - পুরস্কারসন্দেশের কোমরবন্ধনীর মতোই। এত দ্রুত কোন কবিতার বই আমি আজ অব্দি পড়িনি। হতাশা এসেছিলো অনেক পরে, প্রথমটা বিস্ময়। মনের ভাবনাপ্রবাহের নিচে সমস্ত ঝাঁঝরিগুলো বন্ধ ক'রে দিয়েছিলো। একদিন পার্ক-করা গাড়িতে বসে পড়ছিলাম বইটা। গাড়ির জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখলাম একটা বিরাট রিভার-বার্চ গাছের নিচে গাড়িটা রেখেছি। অগাস্ট মাসেই সে গাছে হেমন্ত নেমেছে। ঝ'রে গেছে তার সবুজাভা, তার মননের সমস্ত সাঙ্গীতিক পাতাগুলো। ফলে চ'লে গেছে জ্যামিতিও। যে কঙ্কাল সটান দাঁড়িয়ে তার জ্যামিতিতে সামান্য কয়েকটা বক্ররেখার অরাজকতা। মানসিক হাসপাতাল থেকে সদ্য বেরিয়ে এসে সুস্থ হয়ে ওঠার মরণপণ চেষ্টায় সে লিখছে 'হাসপাতালে লেখা কবিতাগুচ্ছ'। প্রিয় কবি বিনয়কে খুঁজে পাইনি কোথাও। এই প্রথম পেলাম মানসিক হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসা এক বৃদ্ধ রোগীকে। হয়তো যাঁর নাম বিনয়ম্‌ জুমদার।

না হয় চাকা বহুদূর গড়িয়ে চলে গেছে। তবুও কি সেই অগ্নিগর্ভাকে পুরস্কার দেওয়া যায় না সে আমাদের অতীতের পুরনো পাপ ব'লে ? নাকি আকাদেমির হাস্যকর নিয়মের ফাঁসে সে প'ড়ে গেল ব'লে ? যে বিনয় পুরস্কৃত হলেন তিনিই কি সেই প্রিয় কবি ? পাপস্খলনের একটা বড়ো সুযোগ ছিলো বাংলা কবিতার কাছে। সেটা সে হেলায় হারালো। শেষ কাব্যগ্রন্থে রয়ে গেল এক মেধাবী, তীব্রোজ্জ্বল, বিরলতম কবির সাংঘাতিকভাবে জখম কবিতা।

আমি এক বিন্দু এক বিন্দু মধু নিয়েছি
তোদের কিছু গন্ধ কিছু গন্ধ ধার নিয়েছিঃ

১। বিনয় মজুমদারের শ্রেষ্ঠ কবিতা, দেজ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৮১।
২। 'অনাদি সময় থেকে গণিতেরই মতো বহু কবিতা রয়েছে', আনীলের জার্নাল, আর্যনীল মুখোপাধ্যায়, পাঠক, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর, ২০১৬।
৩। ধূসর জীবনানন্দ, বিনয় মজুমদার, কবিতীর্থ, প্রথম প্রকাশ, মার্চ ২০০৭।
৪। বিনয় ও কৌরব, সম্পাঃ অভিজিৎ মিত্র, কৌরব, প্রথম প্রকাশ ২০১৪।
৫। Barbaric Vast & Wild, Poems for the Millennium vol.5, Edited with commentaries by Jerome Rothenberg and John Bloomberg-Rissman, Black Widow Press, 1st Edition, March 2015.
৬। হাসপাতালে লেখা কবিতাগুচ্ছ, বিনয় মজুমদার, কবিতীর্থ, মার্চ ২০০৩।

===